মেটেবুরুজের কৌমজীবন

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাতা থেকে
মেটেবুরুজ-বিষয়ক একটি সংকলন

গার্ডেনরীচের দরজী শিল্প

তপন সরকার

কলকাতার দক্ষিণ দিকে বলতে গার্ডেনরীচকেও বোঝায়। গার্ডেনরীচ কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের একটি অংশ। যদি আপনি গার্ডেনরীচের ভেতর দিকে ধীরে সন্তর্পনে অগ্রসর হন, অর্থাৎ রাজাবাগান কিংবা আক্‌ড়া ফটকের দিকে বা রামদাসহাটীর দিকে যান, আপনি শুনতে পাবেন দরজীদের মেশিনের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ। এবং তারপর যদি হঠাৎ রাস্তার এদিক ওদিক তাকান তাহলে দেখতে পাবেন, ছোটো বড়ো অসংখ্য বাড়ীর বারান্দায় প্রচুর আবাল বৃদ্ধ-বনিতা নিবিষ্ট চিত্তে ছুঁচে সূতো পড়িয়ে জামা সেলাই করছেন। যদি আপনি সেখানে গিয়ে দাঁড়ান, দেখতে পাবেন কেউ জামা কাটছেন, কেউ জামার পকেট করছেন, আবার কেউ হয়ত প্যান্টের বোতাম লাগাচ্ছেন। বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরনের কাজ আপনার চোখে পড়বে। আবার এ-ও দেখতে পাবেন বিভিন্ন রকমের অসংখ্য ছোটো ছোটো কাপড়ের টুক্‌রো এক সঙ্গে জড়ো হয়ে দোকানের সামনে পড়ে আছে। যেখানে ওদের কাজকর্ম হয় অর্থাৎ চওড়া বারান্দা মতো জায়গা, সেখানটাকে ওদের ভাষায় "দলিজ"[১] বলে। বহু অতি প্রাচীনকাল থেকেই দরজীদের এই ব্যবসা আরম্ভ হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় অযোধ্যার নবাব 'ওয়াজেদ আলি'কে এই গার্ডেনরীচেই নির্বাসন দেওয়া হয়। প্রায় তখন থেকেই দরজীদের এই ব্যবসা আরম্ভ হয়েছে।[২]

এই প্রবন্ধটি মুদিয়ালী বিদ্যালয় পত্রিকা 'পল্লব'-এর ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্রোড়পত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। তপন সরকার ঐ বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। পত্রিকার ঐ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। অঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে প্রায় তিন দশকের বেশি সময় জুড়ে নিয়মিতভাবে এই বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ হয়ে চলেছে। মুদিয়ালী বিদ্যালয় গার্ডেনরীচ মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলের ১৪৬ বছরের পুরনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রবন্ধ রচনার পরবর্তী সময়ে স্থানীয় দরজী শিল্পে বেশ খানিকটা বদল হয়েছে। এছাড়া, প্রবন্ধকারের সমীক্ষার মধ্যেও কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। সব মিলিয়ে, প্রবন্ধটি বর্তমান পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য করে তোলার জন্য একটি টীকা সংযোজন করা হল। টীকা প্রস্তুত করেছেন দরজী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সামসুদ্দিন পুরকাইত।

তাঁতীরা যখন কাপড়, গামছা, প্রভৃতি তৈরি করে তখন তাঁদের এইসব কাজকে তাঁত-শিল্প বলা হয়। ঠিক দরজীদের এইসব কাজকেও 'দরজী-শিল্প' বলা চলে এবং এই শিল্প কুটির শিল্পের অন্যতম। দরজীরা মূলত এই কাজ করেই দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা উপার্জন করেন। তাঁদের ছেলেরা যখন শিশু থেকে আস্তে আস্তে একটা বালকে পরিণত হয়, (অন্তত আট থেকে দশ বছর) তখন থেকেই তারা আস্তে আস্তে তাঁদের এই ব্যবসায় নেমে পড়ে।

এবার যদি আপনি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন ভোর হতেই ওঁরা চলেছেন কাপড়ের গাঁটরী নিয়ে। ভোর চারটের সময় ওঠেন ট্যাকসিতে। জন পাঁচেক। এর পর ট্যাক্সি ছুটে চলে তীর বেগে। হাটে। মঙ্গলবার হাওড়ার হাটে, বুধবার মানিকতলায় ও চেতলায়, রবিবার শ্যামবাজারে।[৩] সুতরাং ভোরের মুখে কাঁচিসড়কে দেখতে পাবেন লাইন দিয়ে যাচ্ছে ট্যাকসির পর ট্যাকসি, তাতে খালি জন পাঁচেক লোক আর কাপড়ের গাঁটরী। কিন্তু আগেই বলেছি, ওঁদের হাট হয় কোথায়। হাওড়ার হাটই ওঁদের সবচেয়ে বড়ো হাট। ওখান থেকেই ওঁরা বেশীর ভাগ অর্ডার নিয়ে আসে। ওঁরা ভোর বেলায় যান, হাটে, ওঁদের মধ্যে কেউ হয়ত বাড়ি ফেরেন বেলা একটায়, কেউ বিকেল পাঁচটায়, আবার কেউ হয়ত রাত্রি দশটা-এগারোটায়। তারপরে কোনরকমে কাজ কর্ম সেরে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করেন। যদি পরের দিন হাট থাকে তবে ভোর বেলায় ওঁদের আবার যেতে হয়। সাধারণত বড়ো হাট হয় সপ্তাহে তিন দিন। কিন্তু বাকি দিনগুলো ওঁরা ছোটো ছোটো হাটে ফেরি করতে যান। সেখানে ওনাদের চাহিদা বেশি। প্রয়োজন মতো ওনারা হাট থেকে বিভিন্ন রকমের অর্ডার নিয়ে আসেন আবার সময় মতো যোগান দেন। যেদিন হাট থাকে না সেদিন দেখতে পাবেন সকাল থেকেই মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দ আর ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ওঁদেরই ছেলেরা অথবা কাছাকাছি কোনও আত্মীয় থাকলে তাঁরা, আবার কেউ হয়ত মাইনে দিয়ে কর্মচারী রাখেন। ওঁদের এইসব কাজে ঘরের মেয়েরাও সাহায্য করেন।[৪] যেমন সেলাই করা ব্লাউজের কাপড় কাটা, বোতাম লাগানো এই সব ছোটো ছোটো কাজে।

দরজীদের আয় ব্যয় সম্বন্ধে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্রমশ আয় কমে যাচ্ছে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বহু লোকই সেরকম জামা প্যান্টের কাপড় কিনতে পারে না। এর ফলে অনেক

অর্ডার ওঁদের কমে যাচ্ছে। যেখানে ওনারা দিনে দশটা অর্ডার পেতেন, সেখানে ওঁনারা বর্তমানে পাঁচটার বেশি পান না। ফলে পূর্বের মতো আয় ওনাদের হয় না। এর পরেও দেখা যায় ওনাদের প্রতিযোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এমনও দেখা যায় যে হয়ত যিনি কোনদিনও দরজীর ব্যবসায় নামেন নি বা সেটা তাঁর জাত ব্যবসা নয়, তিনিও একটা মেশিন কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়লেন একটা দোকান করে। এর পরেও দেখা যায় পূর্বে বাজারে একটা দরজী দিনে যেখানে দশটা অর্ডার পেতেন বর্তমানে তিনি পাচ্ছেন পাঁচটা। আবার বাকি পাঁচটাও বাজারে প্রতিযোগীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ওঁদের লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু তবুও হিসাব করে দেখা যায়, ওঁদের গড় মাসিক আয় কোনও মাসে ৩৫০ টাকা, কোনও মাসে ৪০০ টাকা, আবার কোনও মাসে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা।[৫] এটা ওঁদের নির্দিষ্ট আয় নয়। ওঁদের আয় তখনই বেশি হয়, যেমন হিন্দুদের কোনও উৎসব, পূজা ইত্যাদিতে, তা ছাড়া মুসলমানদের পরবের সময়ও আয় কিছুটা বেশি হয়। যেমন সবে-বরাত, ইদলফেতর ইত্যাদি, কিন্তু মোট-খরচ বাদ দিলে অর্থাৎ সুতো, শ্রমিকের নিজেদের মজুরি, মেশিনের খরচা, কাপড়ের দাম এবং যাতায়াত খরচা বাদ দিলে কম করে দু'শো টাকা লাভ থাকে। বেশি আয় হলে তিনশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত লাভ থাকে।

মোটামুটিভাবে ওঁনাদের পরিবার পিছু লোক বা পেট আট থেকে নয় জন। আবার কারও পাঁচ থেকে ছয় জনকে নিয়েও। ওঁদের একটি সংসার তিনশো সাড়ে-তিনশো টাকায় চলে যায়। কিন্তু যে মাসে ওঁদের কম আয় হয় সে মাসে ওঁদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। ফলে টাকা ধার করেন। এবং পরের মাসের লাভের অংশ থেকে মিটিয়ে দেন। মোটামুটিভাবে, ওঁরা মাটির দু'চালা ঘর বা ছোটো পাকাবাড়িতে বাস করেন। বহু দরজীকে আবার দোকানের ভাড়াও দিতে হয়। কিন্তু এর পরেও ওঁদের আয়ের প্রায় অনেকটা অংশই ব্যয় হয়। সিনেমা ওঁদের দশবছর থেকে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধারও দেখতে অভ্যস্ত। জুয়া-ত প্রচণ্ডভাবে চালু আছে। এ এক ভয়ংকর নেশা। অবশ্য দায়ী ওঁরা নন, দায়ী সমাজ আর তার পরিবেশ সৃষ্টিকারীরা। তবে সকলেই এ অভ্যাসের শিকার নন।

শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে দরজীদের অবস্থা মোটামুটি। ওঁদের ছেলেরা ওঁদের এই সব কাজের মধ্যে জড়িত থেকেও লেখাপড়া করে। এবং সমাজের সঙ্গে তালে তাল রেখে চলে। ওঁদের শিক্ষিতদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ থেকে আঠাশ

জন, অক্ষর পরিচিত পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচাত্তর জন, আর নিরক্ষর প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশজন (ওঁদের হিসেব মতো)।

শেষ খবরে জানা গেছে যে, দরজী শ্রমিকরা তাঁদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য মালিকদের কাছে প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। কিন্তু মালিকরা অর্থাৎ ওস্তাগারেরা এটা মেনে নেয় নি। এর ফলে প্রথম দরজীরা উনিশে আগষ্ট থেকে এক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। ওঁদের দাবি পূর্বে যা মজুরি ছিল তার চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি। এই প্রস্তাব সকল দরজী শ্রমিক মেনে নিয়ে সকলেই ধর্মঘটের ডাকে সামিল হয়েছিলেন। সমস্ত দরজী শ্রমিকেরা একতাবদ্ধ হয়ে তাঁদের নেতৃত্বের কাজ চালাচ্ছেন। আমার এই লেখা চলাকালীন পর্যন্ত ওঁদের ফলাফল সম্বন্ধে জানা যায়, অনেক মালিক অর্থাৎ ওস্তাগারেরা ওঁদের এই দাবি সমস্তটা মেনে না নিয়ে কিছুটা মেনে নিয়েছেন। শতকরা পঁচিশ পয়সা মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এই দাবিটুকু যারা এখনও মেনে নেয় নি তাদের অধীনে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করেন তারা এখনও ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন নি। দরজীদের একটি ইউনিয়নও গঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। সমস্ত দরজী মিলেই এই ইউনিয়ন গঠন করেছেন।

ভূমিকার বদলে : দরজীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই রিপোর্ট-টি রচিত হয়েছে। পড়ে মনে হতে পারে এটা তেমন গভীর নয়। ভাসা ভাসা একটি রিপোর্ট মাত্র। কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করেও তেমন গভীরে প্রবেশ করতে পারি নি। কারণ যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বটি যে কী সাংঘাতিক পর্যায়ে গেছে তা দরজীদের সঙ্গে কথোপকথনে উপলব্ধি করেছি। ওঁনারা বলতে গিয়ে কেমন যেন থেমে গেছেন, কোনও এক আশঙ্কা আর অনাস্থায় যেন এড়িয়ে গেছেন, প্রাণের দরজা খুলতে গিয়েও যেন আধভেজা করে কথা বলেছেন।

টীকা

১. *দলিজ বা দহ্‌লিজ-এর অর্থ বাইরের ঘর। দরজী পরিবারের লোকেরা এখানে বসে অতিথি বা মেহ্‌মানদের সঙ্গে কথা বলে। দরজী শিল্প যেহেতু ঘরেলু-শিল্প, তাই দহ্‌লিজ-কে দরজী পরিবার সেলাই, কাটিং ইত্যাদি কাজের জায়গা হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। এমনকী, এখন সেখানে বাইরের ক্রেতারা এসে থাকে, ব্যবসার কথাবার্তা বলে।*

২. *মেটেবুরুজ অতীতে ছিল সুন্দরবনের অংশ। চাষবাসের অঙ্গ হিসাবে দরজী-কাজকর্মের সূচনা হয়েছিল নবাব ওয়াজেদ আলি এখানে আসার আগেই।*

একধরনের ফতুয়া, গেঞ্জে, নিমা বানানো হত বস্ত্র হিসাবে। তবে সূক্ষ্ম কাজের শুরু লক্ষ্মৌ ঘরাণার প্রবেশের পর থেকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসার পর ইংরেজ মহিলাদের গাউন ইত্যাদি পোশাক তৈরির কাজেও এখানকার দরজীরা বংশানুক্রমিকভাবে সুদক্ষ হয়ে ওঠে।

৩. ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাইরের হাটগুলি ছাড়াও স্থানীয় কারবালা অঞ্চলে ছোটো ছোটো মার্কেট দরজী-শিল্পের ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ছোটো খদ্দেররা এখানে এসে মাল তৈরি করে নিয়ে যেত। পরে এখানে বড়ো বড়ো কয়েকটি হাট তৈরি হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং মেশিনপত্র তৈরির কারখানা ব্রাভো অ্যাণ্ড কোং দশ-বারো বছর বন্ধ থাকার পর ওখানে তৈরি হয় জব্বার হাট। তারপর একে একে চাঁদ হাট (পরে বন্ধ হয়ে যায়), সাকিলা হাট, জনতা হাট, এবিএম ইত্যাদি— বড়তলা অঞ্চলে সারাদেশ থেকে ক্রেতা সমাগম হতে থাকে। এইসব হাট আসলে বড়ো রেডিমেট গার্মেন্ট কমপ্লেক্স। এদিকে কারবালা লাইনের ৮০ শতাংশ হাট এখন বন্ধ।

৪. দরজী-শিল্পে সেলাইয়ের কাজ করে দরজীরা, তাদের বলা যেতে পারে এ-শিল্পের শ্রমিক। মালিক বা ওস্তাগাররা ব্যবসার কাজ দেখে। ছোটো ওস্তাগাররা প্যাটার্ন বিছিয়ে কাটিং করে দেয়। কোনও ওস্তাগারই সেলাই করে না, জানলেও নয়। ওস্তাগার পরিবারের মেয়েরা কখনও কখনও বোতাম টাকা, কাজ-ঘর বসানো, তুরপুই, হুক টাকা ইত্যাদি করে, কিন্তু কখনই কাটিং বা সেলাই করে না।

৫. দরজীদের সাপ্তাহিক আয় ৪০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। কাজের মান অনুযায়ী আয়, যেমন, খেলো কাজে আয় কম। শীতকালে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দরজীদের কাজে মন্দা চলে। বহিরাগত দরজীরা, যারা মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ থেকে এসে এখানে কাজ করে, তারা এই মন্দার সময় গ্রামে চাষের কাজে বা অন্য কাজে চলে যায়। এমনকী, রিক্শাওয়ালাদেরও কাজ থাকে না। বাজারঘাটে স্পষ্টভাবে মন্দা বোঝা যায়।

ওস্তাগাররা একরকম নয়। পাঁচ-সাত লাখ টাকা বছরে আয় আছে, আয়কর দেয়, একরম ব্যবসায়ী আছে। দুই-চার লাখ টাকা বছরে আয় করে এমন হাজার পাঁচেক ওস্তাগার এ-অঞ্চলে আছে। সবমিলিয়ে, মহেশতলা-চটা পর্যন্ত হাজার বারো ওস্তাগার আছে। দরজী সবমিলিয়ে চার লক্ষের ওপরে, তার মধ্যে তিন লক্ষ স্থানীয়। আনুষঙ্গিক শিল্পে রয়েছে আরও লক্ষাধিক মানুষ। এছাড়া, মাড়োয়ারি কাপড় বিক্রেতা রয়েছে আরও হাজার দশেক।

বড়ো ওস্তাগার, যারা রপ্তানীযোগ্য পোশাক তৈরি করে, তাদের অবস্থা আগের তুলনায় খারাপ। কেননা, বাইরের, এমনকী বিদেশের বড়ো বড়ো ব্র্যাণ্ডেড কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা যাচ্ছে না।